রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সমস্ত দিক থেকেই এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব যেমন একক ব্যক্তিত্বে রেনেসাঁস এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি অনেকটা একক ব্যক্তিত্বে রেনেসাঁস ঘটিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে-শিল্পে। তাঁর সমকাল ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ দু'টি মহাসংকটকে চিহ্নিত করে। একটি প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আগেই বলেছি, ভারত তথা বাংলাদেশের বুকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব ছিল না, যা কিছু ঘটেছে পরোক্ষে এবং তা ঘটাও স্বাভাবিক, কারণ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে ভারতবর্ষে সে সময়ের যে কোনো বিশ্বযুদ্ধের কোনো না কোনো প্রতিক্রিয়া থাকতে বাধ্য।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একেবারে ভারত তথা বাংলাদেশের মাঝখানে এসে স্থান করে নেয়, তা ঘরের উঠোন ছেড়ে ঘরের দরজা-জানালায় প্রবলভাবে আঘাত করতে থাকে, করে ভাঙচুর! বাংলা সাহিত্যে তাই এই যুদ্ধের প্রভাব যেমন ব্যাপক, প্রত্যক্ষ, তেমনি গভীর থেকে গভীরতম। এ এক সন্ধিক্ষণের সংকট। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি অধ্যায়ের সূচক-প্রতিভা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল ও কল্লোল-এর প্রকাশ-সীমা দিয়ে বাঁধা একটি পর্যায় হল ছোটগল্প ধারার দ্বিতীয় অধ্যায়, নিশ্চিতভাবে যাত্রাপথে লক্ষণীয় মোড় ফেরানোর স্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর এক 'মাইলস্টোন'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে টানা ছ'টি বছর ধরে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের শুরুতেই যার শুরু, ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরের শুরুতেই তার শেষ। এই সামান্য ছ'টি বছর যেন রুদ্ধশ্বাস এক শ্মশানবাসী তান্ত্রিকের চরম সাধনার মুহূর্ত। রক্তচক্ষু দৈত্যের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেশের বাইরের ও ভেতরের জীবন-স্বভাবে ত্বরিত বদল ঘটায় নানান দিকের। যে সমস্ত বৃটিশ-বিরোধী গণ-আন্দোলন বার বার নানাভাবে আশা-নিরাশায় ওঠানামা করছিল, সেগুলির চরম রূপ তৈরি হয় বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে, সাম্যবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতায়, দেশীয় রাজনীতির নানান ক্রস-কারেন্টে। আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভয়াল মন্বন্তর, বিদেশি শাসক ও শোষক শ্রেণীর চরম অবিমৃষ্যকারী শাসনব্যবস্থা, কলকাতার বুকে বাংলাদেশের সীমান্তে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের পদসঞ্চার ঘটনা! বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মধ্যবিত্ত মানুষ ও সংসারে ভাঙন, অবক্ষয়, পচন, পতন, মেয়েদের চাকরি করতে বেরিয়ে আসার সুযোগে গণিকাবৃত্তির রকমফেরে আবির্ভাব, সর্বপ্রথম মজুতদার-কালোবাজারি-মুনাফাখোরদের সৃষ্টি— এসব দিয়ে ভারত তথা বাংলাদেশের জনজীবনে এক অস্বাভাবিক দুঃসহ চাপ সৃষ্টি হয়।

একসময় যুদ্ধ শেষ, তবু ভারত পরাধীন থাকে টানা একবছর দশ মাস। এর মধ্যে ছেচল্লিশের দাঙ্গা বাধে। আসে স্বাধীনতা, কিন্তু সে পরভোজী গাছের মতো সঙ্গে আনে দাঙ্গা, দেশ বিভাজনের লজ্জা ও জ্বালা, অসহায় বাস্তুহারার দল, অসম্ভব অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশীয় শাসকদের হাতে ক্ষমতা এলেও রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংকট ও সংঘর্ষ। এসবের মধ্যেই পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত

Scanned with CamScanner

একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, চীন-ভারত সংঘর্ষ, সাম্যবাদী দলে ভাঙন, নকশাল আন্দোলন, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সে সময়ের শাসকদের সারা রাজ্যজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা—এসব চিহ্নিত ঐতিহাসিক সত্য হয়ে ওঠে।

এবং এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একে একে লক্ষণীয় বিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়। 'কল্লোল'-এর কালে যা ছিল নবীনতার, যৌবন-ভাবনার, আবেগের, রবীন্দ্র-বিরোধের—যুদ্ধের ভস্ম থেকে উঠে-আসা গল্পের শরীর ও মন থেকে সে সব সরতে থাকে, আসে যুদ্ধের প্রত্যক্ষতা-জনিত বাস্তব অবস্থার মধ্যেকার গভীরে প্রোথিত ক্ষতচিহ্নগুলি। যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই সে সময়ের তরুণ লেখককুলের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ দেখা দেন। আসেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ। যুদ্ধ শুরুর কিছু পরে-পরেই দেখা দেন সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ, কমলকুমার মজুমদার, সতীনাথ ভাদুড়ী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ। পঞ্চাশের দশকের প্রথম ও মাঝামাঝি কাল থেকে আবার একদল তরুণ লেখকের আবির্ভাব হতে থাকে যাঁদের কাছে যুদ্ধ হল বালক ও কিশোর কালের বিস্ময়-চকিত, কখনো বা অনাস্বাদিত তিক্ত অভিজ্ঞতা মাত্র। ষাটের ও সত্তরের দশকের গল্পকাররা দেশীয় শাসনে অভ্যস্ত অভিজ্ঞতায় আর এক গল্পের দিকে মুখ ফেরাতে সচেষ্ট।

অবশ্যই মনে রাখা দরকার, কল্লোলের কালের তরুণ লেখকরা, প্রায় ক্ষমতাবান সকলেই গল্পের বিষয়ে সমকাল নিয়ে অভিনিবিষ্ট হলেন। মন্বন্তরকে নিয়ে অসাধারণ, যদিও আবেগধর্মী কিছুটা, তবু, সার্থক গল্প লিখলেন প্রবোধকুমার সান্যাল 'অঙ্গার' নামে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কে বাঁচায় কে বাঁচে'র নামে, মনোজ বসু লিখলেন 'একদা নিশীথকালে' নামে। গণবিক্ষোভ ও তার প্রতিবাদী স্বভাব নিয়ে গল্প রচনা করলেন নবেন্দু ঘোষ তাঁর 'এই সীমান্তে' গ্রন্থের একাধিক গল্পের জন্ম দিয়ে। যুদ্ধের অসামান্য প্রতিক্রিয়া ও করুণ স্পর্শকাতরতার ছবি আছে রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খেলনা' গ্রন্থের গল্পগুলি, সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গভীর যক্ষ্মাক্রান্ত সমাজ-রূপের অসামান্য দলিল যেন! যে পতিতার কথা পেয়েছি কল্লোলের কালে 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে, নবেন্দু ঘোষের 'কান্না', বিমল করের 'আঙ্গুরলতা' এমন সব গল্পে সেগুলি যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসা তাদেরই অন্যরূপ! চিরকালের মানবতা-বিরোধী দাঙ্গার কথা মনে রেখে সমরেশ বসু তাঁর অসামান্য প্রথম যে গল্পটি আমাদের উপহার দেন, তা হল 'আদাব'।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষকেও প্রসঙ্গত স্মরণ করতেই হয়। এই তিন লেখকই প্রখর কাল-সচেতন গল্পকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পে, যদিও আবেগ ও সেন্টিমেন্ট বড় কথা, তবু দেশীয় জাতিত্ব-ভাবনা তাতে উপেক্ষিত থাকেনি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখলেন নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী পুরুষ-রমণীর একই সঙ্গে পেশা ও প্রেমকে কেন্দ্র করে অসামান্য প্রেমের গল্প 'রস'। সুবোধ ঘোষের হাতে পাই 'ফসিল' 'গোত্রান্তর', 'অযান্ত্রিক', 'পরশুরামের কুঠার'এর মতো গল্প। শেষোক্ত গল্পে পতিতা ধনিয়ার আর এক

Scanned with CamScanner

রূপ। 'ফসিল' গল্প যেন সুবিশাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই বৃহৎ শক্তিদের রাজনৈতিক চালবাজির এক অতি-সংক্ষিপ্ত চিত্র। এ গল্প যেন সেই অভিজ্ঞতারই 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ'। 'গোত্রান্তর' গল্পের মধ্যবিত্ত নায়কের যে প্রতিচিত্রণ চোখে পড়ে, তা একালের নবগঠিত সমাজ-ন্যায়ের সার্থক বাস্তব চিত্রায়ণ। 'সুন্দরম', 'অযান্ত্রিক' এসব গল্পে সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য ও স্বভাবকে অপূর্বত্ব ও অভিনবত্ব দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর আগে পর্যন্ত, প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের পরের সময় থেকেই বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাবের আধার ক্রমশ বদলাতে থাকে। শুরু রবীন্দ্রনাথ, পরে রবীন্দ্রনাথ তো নিশ্চয়ই, ক্রমশ 'সবুজপত্র', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাগুলি ধরে একে একে বিশ শতকের প্রথম দু-তিন দশকেই গল্পকার হয়ে দেখা দেন প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখিকা-কুলের শরৎকুমারী চৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাধুরীলতা, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, সীতা ও শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া—এঁরা সকলেই। বস্তুত এঁরা ছোটগল্প লিখে প্রকাশ্য হন প্রধানত পত্রিকা ধরেই। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, জলধর সেন, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখও পত্রিকা-নির্ভর গোষ্ঠী ভাবনার বাইরের লেখক হয়ে থাকতে পারেননি।

এইসব তালিকা দিয়ে লেখকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো এখানে প্রধান কথা নয়, আসলে আমাদের কথা হল, যে ছোটগল্প ও তার গল্পকার পত্রিকাশ্রয়ী ছিল প্রথম থেকে বিশের দশকের শেষ পর্যন্ত, সেই নির্ভরতা কমে যেতে থাকে। 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি', 'উত্তরা' ও পরে 'অলকা'—এসব পত্রিকা বিশের দশকে দেখা দিয়ে ক্ষীণ অবয়বে তিরিশের দশকের শেষ পর্যন্ত গল্প-উপন্যাসকে, তাদের রচয়িতাকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে। কিন্তু ক্রমশ পত্রিকা বন্ধ হয়, লেখকরা পত্রিকা-মুখিন না থেকে ব্যক্তিগত প্রেরণাকেই তাঁদের গল্পের জন্মের উৎসমুখ করেন—মুখ্যত ব্যক্তিগত মানসিক প্রেরণা, মনন, গৌণ পত্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ!

অর্থাৎ, বাংলা ছোটগল্প ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থেকে তার অনিকেত স্বভাব ত্যাগ করে। 'কল্লোল' উঠে যায় উনিশশো উনত্রিশে। তিরিশের দশকের গল্পকাররা পত্রিকার চাহিদা ও দাবি মেটাতেই গল্পের কলম ধরেননি, সাহিত্যের যে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মধর্ম তারই মধ্যে সদা বর্তমান থাকে, গল্পকাররা তাতেই অজস্র গল্প লিখে গেছেন। গল্পের বিষয়ে এসেছে বৈচিত্র্য—রোমাঞ্চ, মনন, কৌতুকরস, ব্যঙ্গ, রাজনীতি, তীব্রতম নাগরিক বুদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু পত্রিকার পাতা ভরানোর জন্য গল্পরচনা—এই তাগিদ ও আবেগের দিন অবসিত হয়। তবু যেসব গল্প পাই—তা লেখক-ব্যক্তিত্বেরই পরিচ্ছন্ন প্রতিচ্ছায়া, নূতন প্রসঙ্গ ও প্রকরণে আত্মপ্রকাশ!

স্বভাবতই এসব প্রসঙ্গের শেষে আসে পত্রিকা যদি গল্পের ধারক অর্থাৎ আধার না হয়, গোষ্ঠীনির্ভর সাহিত্য-ভাবনা যদি সে সময়ের বুদ্ধিজীবীদের সমবেত স্বভাবে তাড়িত না করে, তাহলে বাংলা ছোটগল্পের একাধিক স্বর্ণকমল—আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল থেকে উত্তরকালে বিস্ময়করভাবে পাই কী করে! আমরা গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে প্রসঙ্গত বলি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নতুন নতুন বিষয়ের চাপে সাহিত্যের

Scanned with CamScanner

স্বস্থানকে নতুন করে নির্মাণ করার তাগিদ দেয়। তা যেন এক অলিখিত প্রেরণা, সময়ের ললাট-লিখন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এমন প্রত্যক্ষভাবে জীবন, জগৎ, মানুষকে, সমাজ ও অর্থনীতিকে নাড়া দেয়, সবের মধ্যে গভীর ফাটল ধরায় যে, সেখানে প্রচলিত প্রথার হয় ভাঙচুর। প্রত্যেকটি লেখক স্বস্থানে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র অবলম্বন করে গল্প লেখেন। তাই পত্রিকা হয় গৌণ, গোষ্ঠী-সাধনা ও মতবাদ হয় পরিত্যক্ত। আর এই কারণেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু—কেউই একটিমাত্র গোষ্ঠীর সাহিত্যিক অর্থাৎ গল্পকার হতে পারেননি, একটিমাত্র পত্রিকার লেখক হয়ে দেখা দেননি, কোনো বিশেষ পত্রিকার আদর্শে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘোষকের ভূমিকাতেও আসেননি। যুদ্ধের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে নিজেদের মতো করে ছোটগল্প লিখেছেন—যেগুলি সমগ্রভাবে সময়ের ফসল, কিন্তু সময়াতীত স্বভাবের অভিজ্ঞান।

আমরা মনে করি, সময় যখন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকের মতো উথাল-পাথাল হয়, সমাজ যখন চোরাবালির স্বভাবে বার বার ভিতরে অনড় ভাঙতে থাকে, মানুষ যখন বাঁচার জন্যই ভয়ঙ্কর অস্থিত ও অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়, তখন গোষ্ঠী জীবনের যে বন্ধন, মতবাদ তা সত্য হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও উত্তরকাল এবং পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত ছোটগল্প প্রকাশের আধার হতে পারে—এমন কোনো পত্রিকা-নির্ভর গোষ্ঠীচেতনা দানা বাঁধেনি প্রবীণ ও নবীন লেখকদের মধ্যে। এটা ইতিহাসের নিশ্চিত নিয়ম, নির্দেশ! অর্থাৎ 'কল্লোলে'র কালে থেকেও, কল্লোলের উন্মাদনাময় প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের মোহজালে দৃষ্টি রেখেও বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন এক এক করে আপন স্বাতন্ত্র্যে ছোটগল্পের ভূমিতে বিচরণ করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী লেখকরাও আপন ব্যক্তিত্বে গল্পের জন্ম দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকের নিজের পক্ষে দরকার মনে হয়নি কোনো পত্রিকার মতাদর্শগত তাগিদ, দরকার হয়নি পাশাপাশি কোনো লেখক-বুদ্ধিজীবীর গোষ্ঠীচেতনা লালিত সান্নিধ্য।

অবশ্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাংলাদেশের নবীন লেখকদের বিষয় ও প্রকরণ ভাবনায় যে অভিনব প্রেরণা দেয়, যেভাবে, সমস্ত কিছু ভেঙে নতুন কিছু গড়ার বীজ বপন করে, বাংলা ছোটগল্পের লেখককুল তাকে স্বাগত জানান। সে সময়ের তরুণ প্রজন্ম যুদ্ধের উত্তপ্ত অনুভব থেকে সরে এসে আবার গোষ্ঠীগত সাহিত্যভাবনায় নিযুক্ত হয়। একে একে নতুন নতুন পত্রিকা জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু তা কল্লোলের মতো প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসময়ের প্রতিক্রিয়ায় জাত কোনো আধার নয়, সময় তাদের এভাবে এক জায়গায় টানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটি সচেতন লেখককে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বে নাড়া দিতে থাকে। তাই ছোটগল্পের বিষয়-পরিধি যেমন বাড়ে, তেমনি প্রকরণের অভিনব কৌশলগুলি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পের পোশাককে বিচিত্রদর্শী করে তোলে। কোনো পত্রিকার ও গোষ্ঠীর মতের জন্য নয়, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার কারণেই বাংলা ছোটগল্পের ঘটে বিস্ময়কর বিস্ফোরণের মাধ্যমে চমকপ্রদ বিপুল সংখ্যক আলোর ফুলকির আকর্ষণ!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকাল ও উত্তরকাল বাংলা ছোটগল্পে নতুন লেখকদের হাত দিয়ে

Scanned with CamScanner

যেসব বিষয়কে অবধারিতভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভাঙনটা অর্থাৎ সমাজ-মানস ব্যক্তি-মানস ও সামগ্রিক জীবন-বোধের মূল ধরে টানার ফলে যে অবক্ষয় ও ভাঙচুর, যে মানবতার ক্ষয়—সে সব অনেক বেশি 'ইন্ট্রোভার্ট' হয়ে দেখা দেয় ছোটগল্পে। ছোটগল্প বিষয় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে রীতি বদলায়। বাংলা ছোটগল্প কল্লোলের কালের চকিত নবীনতায় ও যৌবন-উন্মাদনায় যে ঢিলে-ঢালা স্বভাব নিয়ে কোথাও কোথাও দেখা দিচ্ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে ষাট ও সত্তর দশক পার হয়ে, তা ক্রমশ শিল্পের আঁট-সাঁট গড়ন পায়। শুধু বিষয় নয়, প্রসঙ্গ নয়, পরিবেশ নয়, প্রকরণেও ছোটগল্প ক্রমশ পরিশীলিত দীপ্ত রূপ পায়।

উনিশশো পঞ্চাশ সাল দিয়ে যে দশক শুরু, সেই দশকে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা দেশীয় রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলির সমবেত প্রয়াসে ও নানান বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে বিশিষ্টতা পেতে থাকে। দেশীয় একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ, তৎকালীন শাসক-বিরোধী সাম্যবাদী আন্দোলনের স্বরূপ, বুর্জোয়া অর্থনীতিকে একমাত্র সত্য ভেবে তার ওপরেই দেশীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নির্মাণ, সদ্য-সৃষ্ট বেকারদের ভয়াবহ ক্রমবর্ধমান রূপ, যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি, নবাগত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থার ঢিলে-ঢালা অবস্থা, যুবজন-চিত্তে অস্থিরতা-অসহায়তা, মাঝে-মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তচক্ষু—এই সবই পঞ্চাশের দশক ও তার পরবর্তী সময়কেও নানান ঘটনায় জটিল করতে থাকে।

আর এই জটিল পরিবেশেই আবার নতুন একদল গল্পকার দেখা দেন বাংলা সাহিত্যে। যাঁদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বয়স ছিল বালককালের, যাঁদের সেই সময়ের চোখে ছিল রুদ্ধশ্বাস, আড়ষ্ট-ভয়ার্ত বিস্ময়, তাঁরাই স্বাধীনতা-প্রাপ্তিকালের আবেগাত্মক অবোধ উত্তেজনা-অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে এই বিশেষ দশকে লেখনী ধরেন। সময়টা চিহ্নিত করা যায় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কিছুটা পরবর্তীকালের সময়-সীমায়। এই সময়ে যুদ্ধ-সমকালে আবির্ভূত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ প্রমুখ ছোটগল্পে যুদ্ধ-সময় ও উত্তরকালের সমাজে তার অন্তঃশীল অভিঘাতকে যথেষ্ট স্পষ্ট করেছেন। এবং এঁদেরই মধ্যে আসেন নতুন নতুন গল্পকার—যাঁদের লেখা ষাট ও সত্তর দশক ধরে যুদ্ধ থেকে সরে-আসা নতুন কিছু কথা বলতে তৎপর হয়। সেই সঙ্গে ছোটগল্পের প্রকরণও নতুন সাজ নিতে ব্যস্ত হয়।

অর্থাৎ যতই সময় যুদ্ধকাল থেকে সরে আসে, দেশীয় শাসনব্যবস্থার একাধিক পরিকল্পনা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মনে আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতা আনে, দেশীয় রাজনৈতিক সমস্যায় প্রতিবেশী একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-ঘটিত সংঘর্ষে দেশের মানুষের নূতন অভিজ্ঞতার জন্ম হয়, যুবকদের মধ্যে হতাশা, অসহায়তা, চতুর্দিকের নিষ্ফলত্ব সংশয় এসব থেকে আত্মিক সংকট তৈরি হয় এবং ষাটের দশকের শেষ থেকেই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রাজনীতির সূত্রে আসে নতুন নতুন বিচিত্র তাত্ত্বিক ও তাদের প্রয়োগগত কৌশলের চমৎকারিত্ব, ততই উপন্যাসের মতো বাংলা ছোটগল্পেও বিষয়ে

Scanned with CamScanner

ভিন্ন স্বাদ বাড়তে থাকে। কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নিয়ে বেশ কিছু আন্দোলনের মুখোমুখি হয় সচেতন পাঠক-জনতা। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালের তিন-চারটি দশকের নবাগত লেখক কল্লোলীয় বিষয় ও রীতি শুধু নয়, যুদ্ধ-সময়ে যে সমস্ত তরুণ গল্পকার ফিনিক্স পাখিদের মতো দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের থেকেও অন্যভাবে গল্পের রূপ ও রীতি নিয়ে ব্যস্ত হন। অস্থিরতা, অবিশ্বাস, সংশয় যেমন এ সময়ের অভিজ্ঞান, তেমনি ক্রমশ চরিত্রদের 'ইনট্রোভার্ট' হয়ে ওঠাও এই গল্পকারদের বিষয়-ভাবনায় ছিল অবধারিত। বুর্জোয়া অর্থনীতি যেভাবে ধনীদের আরও ধনী করছিল, কৃষক-শ্রমিকদের উন্নতির নামে প্রহসনাত্মক ভূমিকা নিচ্ছিল শহরতলি অঞ্চলে ও গ্রামেগঞ্জে, তাতে গতানুগতিক নায়ক-ভাবনা থেকে সরতে চাইছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু যেমন, তেমনি উত্তরসূরি নতুন লেখকগোষ্ঠীও। এবং এটাই স্বাভাবিক, কারণ ছোটগল্প ও উপন্যাস এমনই কাল-চেতনার সঙ্গে সমন্বিত সাহিত্য এবং কাল-চেতনাকে অতিক্রম করারও বড় শিল্পাঙ্গিক—যার জন্য ওই জাতীয় পরিবর্তনই তার কঠিন নিয়তি, তার নিষ্ঠুর ভাগ্য। যেনবা তা, শিল্পের যিনি ঈশ্বর, যিনি তৃতীয় নয়নে একচ্ছত্রাধিপতি, তাঁর সবল কঠিন নির্দেশও! একে অস্বীকার করার ক্ষমতা ছিল না নবাগত লেখকদের। অবশ্যই, আমাদের মতে, সেই লেখক, যিনি অত্যন্ত সতর্ক, বুদ্ধিমান, সংভাবেই কাল-সচেতন, তিনি শিল্প-সচেতন সহৃদয় মনের অধিকারী!

সময় অস্থির, সমাজও দ্রুত বদলাতে চায়। অস্থিত সমাজ আর বিক্ষিপ্ত অনিশ্চয়তার সংশয়াকুল সময় যত স্পষ্ট হবে, গল্পের চেহারাও চাইবে বদল। ছোটগল্পের প্রাণ-স্বভাব, অরূপ-ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে ছোটগল্পকাররা বার বার চেহারা নিয়ে পরীক্ষায় বসবেন নিশ্চয়ই। এটাই যে-কোনো শিল্পের নিয়তি। ছোটগল্প এমন এক শিল্প-মাধ্যম, যার বদল দ্রুত হওয়াই স্বাভাবিক। জীবনের খণ্ড মুহূর্তই যার একমাত্র বিষয়-ভরসা, সমাজ-বাস্তবতাই যার একমাত্র মূলধন, সে ক্ষেত্রে উপন্যাস নয়, ছোটগল্পের ছোট পরিসরে রঙবদল হওয়া স্বাভাবিক, এবং ত্বরিতই।

সব কালেই দেখা যায়, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সেই সময়ের মানুষ নিজে নিজে ফ্যাশন তৈরি করে ফ্যাশন-দুরস্ত হয়ে পুরুষ-রমণী কিছুকাল আপন সৌন্দর্য-ভাবনায় তন্ময়, নিবদ্ধ থাকে। আবার ফ্যাশন বদলায়, নিজেদের রুচির সঙ্গে তাল রেখে মানুষও বদলায়। ফ্যাশন এমন একটি বিষয় যার মূল্য ক্ষণস্থায়ী, যার অস্তিত্বের মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ কালেই শেষ। একালের একাধিক গল্পকার ফ্যাশন-দুরস্ত হবার জন্যেই যেন গল্প লেখেন, গল্পের বিষয় ও জীবনবাণীর টানে নয়। তাতেই ফ্যাশন-সর্বস্বতা তাঁদের রচনাকে সাময়িক করে, পাঠকদের বিরক্তি ও অনীহা তৈরির উপকরণ করে তোলে। ছোটগল্প এমন একটি শিল্প-মাধ্যম যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা দুই-কে নিয়েই করতে হবে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ দু'য়ের ছায়া-কায়ার সম্পর্ক গল্পহীনতাকে লক্ষ্যে রেখে নিষ্ফল রচনা-সম্ভার সাজানো ছোটগল্পের পক্ষে অনুর্বর মাটির আগাছাকেই বাড়ায়, নতুন গল্পের নিঃসীম শূন্য সম্ভাবনাকে কিংবা পাঠায়। সাম্প্রতিক কালের বাংলা ছোটগল্পের কোনো কোনো আন্দোলন মূল্যহীন, জীবন-বিমুখ, ক্ষমতাহীন গল্পকারের অক্ষমতায় সরব আবরণ মাত্র বলেই মনে হয়।

Scanned with CamScanner